السيرة النبوية

أعده وترجمه للغة البنغالية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الثانية: ٩/١٤٢٢ هـ.

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات - الزلفي
السيرة النبوية - الزلفي .
٣٦ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٧ - ٣٤ - ٨١٣ - ٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١ - السيرة النبوية　　أ- العنوان
ديوي ٢٣٩　　١٧/٣١٣٣

رقم الايداع ١٧/٣١٣٣
ردمك : ٧ - ٣٤ - ٨١٣ - ٩٩٦٠

الصف والإخراج: **شعبة توعية الجاليات بالزلفي**

নবী জীবনী

মূর্তি পূজাই ছিল আরব দেশে প্রচলিত ধর্ম। সত্য ধর্মের পরিপন্থী এ ধরণের মূর্তিপূজাবাদ অবলম্বন করার কারণে তাদের এ যুগকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ বলা হয়। লাত, উযযা, মানাত ও হুবল ছিল তাদের প্রসিদ্ধ উপাস্যগুলোর অন্যতম। আরবের কিছু লোক ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম বা অগ্নি পূজকদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আবার স্বল্প সংখ্যক লোক ছিল যারা ইবরাহিম (আঃ) এর প্রদর্শিত পথে ছিল অবিচল, আঁকড়ে ধরেছিল তাঁর আদর্শ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেদুঈনরা সম্পূর্ণ ভাবে পশুসম্পদের উপর নির্ভর করত। আর নগরবাসীদের নিকট অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে মক্কাই ছিল বৃহত্তর বাণিজ্য নগরী। অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়ন ও নাগরিক সভ্যতা ছিল। সামাজিক দিক দিয়ে যুলুম সর্বত্র বিরাজমান ছিল, সেখানে দূর্বলের ছিলনা কোন অধিকার। কন্যা সন্তানকে জীবদ্দশায় দাফন করা হতো। মান-ইজ্জত ও সম্মানকে করা হতো পদদলিত। সবল দুর্বলের অধিকার হরণ করতো।বহুবিবাহ প্রথার কোন সীমা ছিল না। ব্যভিচার অবাধ ভাবে চলতো। নগণ্য ও তুচ্ছ কারণে যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে,ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতি অত্যধিক ভয়াবহই ছিল।

ইবনুয্‌যাবিহাঈন

রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে কুরাইশরা ছেলে-সন্তান ও সম্পদের গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করতো। তাই তিনি মানত করলেন যে, আল্লাহ যদি তাঁকে দশ জন ছেলে দান করেন, তাহলে তিনি একজনকে কথিত খোদার নৈকট্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে যবেহ্ করবেন। তাঁর সাধ বাস্তব রূপ পেল। দশ জন ছেলে জুটলো তাঁর ভাগ্যে। তাদের একজন ছিলেন নবীর পিতা আব্দুল্লাহ। আব্দুল মুত্তালিব মানত পূরণ করতে চাইলে লোকজন তাঁকে বাধা দেয়, যাতে এটা মানুষের মধ্যে প্রথা না হয়ে যায়। অতঃপর সবাই আব্দুল্লাহ এবং দশটি উটের মধ্যে লটারীর তীর নিক্ষেপ করতে সম্মত হয়। যদি লটারীতে আব্দুল্লাহর নাম আসে, তাহলে প্রতিবার ১০ টি করে উট সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হবে। লটারী বারংবার আব্দুল্লাহর নামে আসতে থাকে। দশমবারে লটারী উটের নামে আসে যখন তাঁর সংখ্যা ১০০ তে দাঁড়ায়। ফলে তারা উট যবেহ্ করল এবং রক্ষা পেলেন আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালিবের সব চাইতে প্রিয় ছেলে ছিলেন। বিশেষতঃ এই ঘটনার পর এবং তাঁর কপালে বিরল বরং নজীরবিহীন জ্যোতি ও দীপ্তি প্রতিভাত হবার পর আব্দুল মুত্তালিবের স্নেহ ও আদর অনেক বেড়ে যায়। আব্দুল্লাহ্ তারুণ্যের সীমায় পা রাখলে, তাঁর পিতা বনী যোহরা গোত্রের আমেনা বিনতে ওয়াহাব নামক এক তরুণীর সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বিয়ের পর আব্দুল্লাহর ললাটে ঝলমলকারী সে জ্যোতি লোপ পেয়ে আমেনার গর্ভে স্থির হয়। আব্দুল্লাহ্ জীবন ও অস্তিত্বের মঞ্চে নিজের দায়িত্ব পালন করে ফেলে। আমেনা অন্তঃসত্ত্বা হবার তিন মাস পর আব্দুল্লাহ্ এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

হোন।কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মদীনায় বনীনাজ্জার গোত্রে তাঁর মামাদের কাছে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় সেখানে। এদিকে গর্ভের মাসগুলো পুরো হয়ে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলো। আমেনা অবশেষে সন্তান প্রসব করলেন। কিন্তু সাধারণ নারীদের মত কোন প্রকার প্রসব বেদনা তিনি অনুভব করেন নি। আর এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় ইংরাজী সনের ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ভোরবেলায়। উল্লেখ্য যে, সে বছরেই হস্তী বাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়।

হস্তী বাহিনীর ঘটনা

হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো,

আবরাহা ছিল ইথিওপিয়ার শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্নর। সে আরবদেরকে কাবা শরীফে হজ্জ করতে দেখে সানআতে (বর্তমানে ইয়ামানের রাজধানী) এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করলো, যেন আরবরা এ নব নির্মিত গির্জায় হজ্জ করে। কেনানা গোত্রের এক লোক (আরবের একটা গোত্র) তা শুনার পর রাতে প্রবেশ করে, গির্জার দেয়ালগুলোকে পায়খানা ও মলদ্বারা পঙ্কিল করে দেয়। আবরাহা এ কথা শুনার পর রাগে ক্ষেপে উঠলো এবং ৬০হাজারের এক বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে কাবাশরীফ ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হলো। নিজের জন্য সে সব চেয়ে বড় হাতীটা পছন্দ করলো। সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়টি হাতী ছিল। মক্কা নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত তারা যাত্রা অব্যাহত রাখলো। তারপর সেনাবা-হিনীকে প্রস্তুত করে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হলো, কিন্তু হাতী বসে গেল কোনক্রমেই কাবার দিকে অগ্রসর করানো গেলনা।

যখন তারা হাতীকে কাবার বিপরীত দিকে অগ্রসর করাতো, দ্রুত সে দিকে অগ্রসর হতো কিন্তু কাবার দিকে অগ্রসর করাতে চাইলে, বসে পড়তো। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যা তাদের উপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করা শুরু করে। ফলে তাদের অবস্থা হয়ে যায় ভক্ষিত তৃণ সদৃশ।প্রত্যেক পাখি তিনটি করে পাথর বহন করে এনেছিল। ১টি পাথর ঠোঁটে আর দুটি পায়ে। পাথর দেহে পড়া মাত্র দেহের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। যারা পলায়ন করে, তারাও পথে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি।

আবরাহার উপর এমন মারাত্মক এক রোগ প্রেরণ করেন, যার ফলে তার সব আঙ্গুল খসেপড়ে এবং সে সানআয় পাখির ছানার মত অবস্থায় পৌঁছাই এবং সেখানে তার মৃত্যু হয়। কুরাইশরা গিরিপথে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। আবরাহার সেনাবাহিনীর এ অশুভ পরিণামের পর তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্মের ৫০দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

দুগ্ধ পান

আরবদের প্রথা ছিল যে, তারা তাদের শিশুদেরকে বেদুঈন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তাদের দৈহিক সুস্থতার অনুকূল পরিবেশ ছিল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাই অসাল্লামের পবিত্র জন্ম লাভের পর বনীসাদ গোত্রের কিছু বেদুঈন লোক মক্কায় আসে। তাদের মহিলারা মক্কার ঘরে ঘরে শিশুর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রাসূলের পিতৃহীনতা ও দারিদ্র্যের কারণে

কেউ তাঁকে নেয়নি। হালিমা সাদিয়াও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। সবার মত তিনিও ছিলেন বিমুখ। শিশু পালনের পারিশ্রমিক দিয়ে জীবনের অভাব অনটন বিমোচন করা ও জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যে মক্কার অধিকাংশ ঘরে শিশুর অনুসন্ধান করেও সফল হয়নি তিনি। অধিকন্তু সে বছরে ছিল অনাবৃষ্টি ও খরা। তাই স্বল্প পারিশ্রমিকে ইয়াতীম সন্তানকে নেয়ার উদ্দেশ্যে আমেনার ঘরে আবার ফিরে আসেন তিনি। হালিমা আপন স্বামীর সাথে মক্কায় মন্থর গতিতে চলে এমন একটি দুর্বল গাধিনী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কোলে নেয়ার পর গাধিনী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলতেছিল এবং অন্যান্য সব জানোয়ারকে পিছনে ফেলে আসছিল। ফলে সফর সঙ্গীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়। হালিমা আরো বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্তনে কোন দুধ ছিল না, তাঁর ছেলে ক্ষুধায় সর্বদা কাঁদতো। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখ স্তনে রাখার পর প্রচুর পরিমাণে দুধ তাঁর স্তনে আসতে লাগলো। বনী সাদ গোত্রের অধ্যুষিত অঞ্চলের অনাবৃষ্টি সর্ম্পকে বলে যে,এ শিশু (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দুধ পান করার বদৌলতে জমিতে উৎপন্ন হতে লাগলো ফল মূল এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু দিতে লাগলো বাচ্চা। অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের পরিবর্তে সুখ ও সমৃদ্ধি সর্বত্র বিরাজমান হয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হালিমার পরিচর্যায় দু’বছর পালিত হোন। তিনি তাঁর প্রতি সর্বতোভাবে যত্নশীলা ছিলেন। এই শিশুকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের গভীরে তিনি বহু অলৌকীক কর্ম-কান্ড ও অবস্থা উপলব্ধি করতেন। দু’বছর শেষ হবার পর হালিমা তাঁকে

মক্কায় মাতা ও দাদার কাছে নিয়ে আসলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বদৌলতে বহু এমন এমন বরকত অবলোকন করেন যে বরকত তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, তাই আমেনার কাছে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দ্বিতীয় বার দেয়ার জন্য আবেদন করেন। আমেনা তাতে সম্মত হোন। হালিমা ইয়াতীম শিশুকে নিয়ে নিজ এলাকায় আনন্দ ও সন্তোষ সহকারে ফিরে আসেন।

বক্ষ বিদারণ

এক দিন শিশু মুহাম্মাদ হালিমার ছেলের সাথে তাঁবু থেকে দূরে খেলা-ধুলা করছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চার বছরের কাছা কাছি। এমতাবস্থায় হালিমার ছেলে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে মায়ের কাছে দৌড়ে এসে তাকে কুরাইশী ভায়ের সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানালো। ঘটনা কি জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তর দেয় যে, দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত লোককে আমাদের কাছ থেকে মুহাম্মাদকে নিয়ে মাটিতে চিৎকরে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি। তার বর্ণনা শেষ না করতেই হালিমা ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ে যান। গিয়ে দেখেন মুহাম্মাদ নিজ স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। হলুদ বর্ণ মুখমন্ডলে ভেসে গেল। দেহ ফ্যাকাশে। তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দেন যে, তিনি ভাল আছেন। তিনি আরো বলেন, সাদা পোশাক পরিহিত দু'ব্যক্তি এসে তাঁর বক্ষবিদীর্ণ করে হৃদয় বের ক'রে কাল জমাট বাঁধা রক্ত বের ক'রে ফেলে দেয়, এবং হৃদয়কে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। বক্ষ মুছিয়ে দৃষ্টির

অন্তরালে চলে যায়। হালিমা বক্ষের সে স্থানটি স্থির করার চেষ্টা করেও কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। এর পর মুহাম্মাদকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসেন। পরের দিন ভোর হতেই হালিমা মুহাম্মাদকে তাঁর মায়ের কাছে মক্কায় নিয়ে আসেন। আমেনা অনির্ধারিত সময়ে হালিমাকে ছেলে নিয়ে আসতে দেখে আশ্চর্যাম্বিত হোন, অথচ তিনি ছেলেকে অন্তর থেকে দেখতে চাচ্ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হালিসা বক্ষ বিদারণের ঘটনার পুরো বিবরণ দেন।

আমেনার মৃত্যু

আমেনা নিজের ইয়াতীম শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে ইয়াসরাবে বনী নাজ্জার গোত্রে মামাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ফলে মুহাম্মাদ ছয় বছর বয়সে মাতৃ-স্নেহ ও আদরের ছায়া থেকে বঞ্চিত হোন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে এ অপূরণীয় ক্ষতির কিছুটা লাঘব করতে হবে। তাই তিনি তাঁর দেখা-শুনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন আট বছর বয়সে পা রাখেন, তখন তাঁর দাদা ইহকাল ত্যাগ করেন। অতঃপর চাচা আবুতালিব আর্থিক অভাব-অনটন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব নেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচা আবু তালেব ও তাঁর স্ত্রী তাঁর (রাসুলের) সাথে আপন ছেলের ন্যায় আচরণ করেন। ইয়াতীম ছেলের সম্পর্ক আপন চাচার সাথে অনেকটা গভীর হয়ে যায়। এ পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেন। সততা ও সত্যবাদিতার

মত গুণে গুণান্বিত হয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। এমন কি, কেউ যদি বলে, আল-আমীন উপস্থিত হয়েছেন, বুঝা হতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আগমন করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন কিছুটা বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবিকার্জনের চেষ্টা শুরু করেন। শ্রম ব্যয় ও উপার্জনের পালা আরম্ভ হলো। তিনি পারিশ্র-মিকের বিনিময়ে কুরাইশের কিছু লোকের ছাগলের রাখাল হিসেবে কাজ করেন। খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ কর্তৃক আয়োজিত এক বাণিজ্যিক ভ্রমণে সিরিয়া গমন করেন। খাদীজা ছিলেন বিত্তশালিনী মহিলা। সে ভ্রমণে সম্পদ ও ব্যবসায়িক সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক ছিল তাঁরই দাস "মাইসেরাহ"। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লামের বরকত ও সততার কারণে খাদীজার এ ব্যবসায়ে নজীরবিহীন লাভ হয়। তিনি স্বীয় দাস মাইসেরাহর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে বলা হয়, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ নিজেই বেচা-কেনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। ক্রেতার ঢল নামে। ফলে কোন যুলুম করা ব্যতিরেকেই আয় হয় প্রচুর। খাদীজা তাঁর দাসের বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এমনিতেও তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি মুহাম্মাদের প্রতি হয়ে পড়েন মুগ্ধ ও অভিভূত। ইতিপূর্বে তিনি একবার বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু স্বামী মারা গেলে বিধবা হয়ে যান। এখন পুনরায় তাঁর মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর সাথে নতুন অভি-জ্ঞতায় প্রবেশ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাই এ ব্যাপারে মুহাম্মাদের মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে নিজের এক আত্মীয়াকে পাঠান। তখন তাঁর বয়স তখন পঁচিশে উন্নীত হয়। তাঁর নিকট খাদীজার আত্মীয়া বিয়ের প্রস্তাব রাখলে তিনি তা গ্রহণ করেন। বিয়ে সম্পাদিত হয়। তাঁরা একে অপরের দ্বারা সুখী হোন। তিনি খাদীজার অর্থ সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দেন। খাদীজার

গর্ভে জন্ম লাভ করেন যয়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মেকুলসুম ও ফাতিমা। এবং কাসিম ও আব্দুল্লাহ নামক দুই ছেলে যারা শৈশবেই মারা যান।

তাঁর বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মক্কার অদূরে অবস্থিত হেরা নামক এক গুহায় তিনি নিরিবিলি ও নির্জন অবস্থায় কয়েক দিন করে কাটিয়ে দিতেন। পবিত্র রমযানের ২১ তারিখের রাতে হেরা গুহায় তাঁর কাছে জিবরাঈল (আঃ) আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০। জিবরাঈল বলেন, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরাঈল দ্বিতীয় বার ও তৃতীয়বারের মত পুনরায় বললেন। তৃতীয়বার জিবরাঈল বলেন,

﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإ نسان ما لم يعلم﴾

অর্থঃ পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালন-কর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (আলাক ১-৫)অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) চলে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আর হেরা গুহায় অবস্থান করতে পারলেন না। তিনি ঘরে এসে খাদীজাকে হৃদয় স্পন্দিত অবস্থায় বলেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। ভীত ও আতংক দূর হয়ে গেলে তিনি সবকিছু খাদীজাকে খুলে বললেন। এর পর তিনি বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ

আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। অতিথিকে সমাদর করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করেন"। কিছু দিন পরে তিনি আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখার জন্য আবার হেরা গুহায় ফিরে আসেন। রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটান। রমযান শেষে হেরা গুহা থেকে অবতরণ করে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন। উপত্যকায় পৌছালে জিবরাঈলকে আকাশ ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতগুলা অবতীর্ণ হয়।

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾

المدثر: ١-٥

অর্থাৎ, "হে চাদরাবৃত! উঠুন,সতর্ক করুন,আপনার পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবি-ত্রতা দূর করুন।" (মুদ্দাস্‌সির- ১-৫)

পরবর্তী সময়ে ওহী অব্যাহত থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পবিত্র দাওয়াতী ব্রত শুরু করলে সর্ব প্রথম তাঁর গুণবতী স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) ঈমানের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর স্বামীর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেন। তাই তিনি ছিলেন সর্ব প্রথম মুসলমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আপন চাচা আবুতালিবের স্নেহ, পরিচর্যা ও অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, যে রাসূলের মাতা ও দাদার পর দেখা-শুনার দায়িত্ব বহন করেন, তাঁর ছেলে আলীর লালন-পালন ও দেখা-শুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ সুন্দর পরিবেশ আলীর অন্তর ও

বিবেক খুলে দেয়। তিনিও ঈমান গ্রহণ করেন। অতঃপর খাদীজার দাস যাইদ বিন হারেসাহ ইসলামের সুশীতল ছয়াতলে সমবেত হোন। অতঃপর রাসূল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বাকারের সাথে ইসলামের ব্যাপারে আলাপ করলে দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সত্যতার সাক্ষ্য দেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গোপন ভাবে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। আর গোপন বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে গোপনীয় স্থান, যেখানে তাঁর সাহাবী, শিষ্য ও আরো অনেক লোক সমবেত হতেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন। অতঃপর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতেন। এ ভাবে অনেক লোক ইসলামের পতাকা তলে একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু সবাই ইসলামকে গোপন রাখতেন। কারো ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেলে কুরাইশের কাফের-দের কঠিন নির্যাতনের শিকার হতেন। এসময়ে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করা হতো।

প্রকাশ্য দাওয়াত

এ ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ৩ বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত দাওয়াতের গোপন ব্রতে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে যে,

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দেন, যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং

মুশরিকদের পরোয়া করবেন না, (হিজরঃ৯৪) এ আদেশ পেয়ে এক দিন তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ ক'রে কুরাইশদেরকে ডাক দেন। তাঁর ডাক শুনে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। তন্মধ্যে তাঁর চাচা আবু লাহাবও একজন ছিল। সে কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সব চাইতে কট্টর শত্রু ছিল।মানুষ সমবেত হবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন,আমি যদি আপনাদেরকে একথার সংবাদ দিই যে, পাহাড়ের পেছনে এক শত্রুদল আপনাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে।আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সবাই এক স্বরে বললো, আমরা আপনার মধ্যে সততা ও সত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই দেখিনি। তিনি বললেন, আমি আপনাদেরকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন এবং মূর্তিপূজা বর্জন করতে বললেন। একথা শুনে আবুলাহাব রাগে ক্ষেপে উঠে বলে,তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক সুরা লাহাব অবতীর্ণ করেন।

﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾

অর্থাৎ, "আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।" (লাহাব- ১-৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাওয়াতী কাজ পুরো দমে অব্যা-

হত রাখলেন। জন সমাবেশ স্থলে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। তিনি কা'বা শরীফের নিকটে নামায আদায় করতেন। মুসলমানদের উপরে কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেলো। ইয়াসের, সুমাইয়্যা ও তাদের সন্তান আম্মারের বেলায় তাই ঘটেছে। খোদাদ্রোহীদের নির্যাতনে আম্মারের পিতা-মাতা শহীদ হোন। সুমাইয়্যা ইসলামে প্রথম শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হোন। নির্যাতনের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিলাল বিন রাবাহ আবুজেহেলের ও উমাইয়্যা বিন খালাফের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। অবশ্যই বিলাল হযরত আবু বাকারের (রাঃ) মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ খবর শুনে তাঁর মালিক অত্যাচারের সব পন্থা অবলম্বন করে যাতে বিলাল ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু তিনি আকঁড়ে ধরেন ইসলামকে এবং অস্বীকার করেন ইসলাম ত্যাগ করতে। উমাইয়্যা তাঁকে শিকলাবদ্ধ করে মক্কার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুকের উপর বিরাট পাথর রেখে উত্তপ্ত বালিতে হেঁচড়াইয়া টানতো। অতঃপর সে ও তাঁর সঙ্গীরা বেত্রাঘাত করতো আর বিলাল শুধু আহাদ, আহাদ, এক, এক, বলতে থাকতেন। এহেন অবস্থায় এক বার আবু বাকর তাকে দেখেন। তিনি বিলালকে উমাইয়্যার কাছ থেকে ক্রয় ক'রে আল্লাহর নিমিত্তে স্বাধীন করে দেন। এ সব পৈশাচিক ও বর্বর অত্যাচারের কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুসলমানদেরকে ইসলাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তাদের সাথে মিলিত হতেন অত্যন্ত সংগোপনে। কেননা প্রকাশ্যভাবে মিলিত হলে মুশরিকরা রাসূলের শিক্ষা প্রদানের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করবে। তাছাড়া দু'দলের সংঘর্ষের আশংকাও ছিল। আর এ কথা সুবিদিত যে, এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ মুসলমানদের ধ্বংস ও সমূলে বিনাশই ডেকে

আনবে। কারণ মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি-সামর্থ্য ছিল খুবই স্বল্প। তাই তাদের ইসলাম গোপন রাখাটাই ছিল দূরদর্শিতা। অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কাফেরদের অত্যাচার সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত ও এবাদতের কাজ করতেন।

হাবশার দিকে হিজরাত

যাঁর ইসলামের কথা ফাঁস হয়ে যেত, তিনি মুশরিকদের নিপীড়নের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন। বিশেষতঃ দুর্বল মুসলমানেরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীদেরকে দ্বীন নিয়ে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার নির্দেশ দেন। তিনি সেখান-কার শাসক নাজ্জাসীর নিকট নিরাপত্তা পাওয়ার আশ্বাস দেন। অনেক মুসলমান নিজের জান ও পরিবার বর্গের ব্যাপারে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতো। তাই নবুওয়াতের ৫ম বছরে প্রায় ৭০জন মুসলমান সপরিবারে হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে উসমান বিন আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। এ দিকে কুরাইশরা ইথিওপিয়ায় হিজরত কারীদের অবস্থান ব্যাহত করার চেষ্টা করে।সে দেশের রাজার জন্য পাঠায় উৎকোচ। পলায়নকারীদের (মুহাজির) বহিষ্কারের অনুরোধ জানায়। তারা আরো বলে যে, মুসলমানরা ঈসা (আঃ) ও মরিয়াম সম্পর্কে অপমানকর ও অশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে। নাজাসী তাদেরকে ঈসা (আঃ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সত্যটি সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেন। শাসক মুসলমানদের আশ্রয় দেন এবং বহিষ্কার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এ বছরের রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হারাম শরীফে যান।সেখানে ছিল কুরাইশদেরর এক দল লোক। তিনি দাঁড়িয়ে

হঠাৎ করে তাদের সামনে সুরায়ে নাজম তেলাওয়াত করতে লাগলেন। এ সব কাফেররা ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহর বাণী শুনেনি। কেননা তারা রাসূলের কিছুই না শুনার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলো। অকস্মাৎ তেলাওয়াতের মধুর ধ্বনি তাদের কর্ণে গেলে তারা আল্লাহর হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক বাণী ও সাবলীল ভাষা একাগ্রচিত্তে শুনে। অন্তরে তা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। এক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ আয়াতটি পড়ে সেজদায় চলে যান। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রন করতে না পেরে তারাও সেজদায় চলে যায়। অনুপস্থিত মুশরিকরা তাদেরকে তিরস্কার করে। অন্য কোন উপায় না দেখে এরা রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে যে, তিনি তাদের মূর্তির প্রশংসা করেন এবং বলেন, 'তাদের (মূর্তিসমূহের) সুপারিশের আশা করা যায়' সেজদা করার অজুহাত স্বরূপ এ ভিত্তিহীন, নিরেট মিথ্যার বেসাতী করে তারা।

উমারের ইসলাম গ্রহণ

উমার (রাঃ)র ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের জন্য বড় বিজয় ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁকে ফারূক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে সত্য ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন। ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পরে উমার (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সত্যের উপরে নই? তদুত্তরে তিনি বললেন, কেন নয়, নিশ্চয় আমরা সত্যের মধ্যে। তখন উমার (রাঃ) বললেন, তাহলে এত গোপনীয়তা কি জন্যে। তখন আরকামের বাড়ীতে সমবেত মুসলমা-

নদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে দ'দলে বিভক্ত করে দেন। হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে একদল এবং উমার বিন খাত্তাবের নেতৃত্বে আর একদল। দাওয়াতী যাত্রার নব সঞ্চারিত শক্তির ঈঙ্গিত দেয়ার জন্যে মক্কার বিভিন্ন অলি-গলি প্রদক্ষণ করেন। কুরাইশরা দাওয়াত দমন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। শাস্তি, নির্যাতন, নিপীড়ন,প্রলোভন ও হুমকি প্রদর্শনের মতো সর্ব প্রকার পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এসব কু-পরিকল্পিনা ও ব্যবস্থাপনা মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি ও দ্বীন ইসলামকে অধিকতর আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

এক নতুন দুরভিসন্ধি ও মন্দ অভিপ্রায় তাদের অন্তরে জন্ম নিল। আর তা হচ্ছে মুসলমান ও বনী হাশেমকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ও একঘরে করে রাখার এক চুক্তিনামা লিখে সবাই তাতে স্বাক্ষর করে কাবাশরীফের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেবে। চুক্তি অনুসারে তাদের সাথে বেচা-কেনা, বিয়ে-শাদি, সাহায্য-সহযোগিতা ও লেন-দেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এ চুক্তির ফলে মুসলমানেরা বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে (শো'বে আবি তালেব নামক) এক উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁরা অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দুঃখের শিকার হন সেখানে। ক্ষুধা ও অর্ধাহারের বিষাক্ত ছোবল থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। স্বচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেন। খাদীজা তাঁর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করেন। বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়লো। অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর প্রায়-দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে একজনও পশ্চাদপদ হননি। অবরোধ একাধারে তিন বছর স্থায়ী রইল। অতঃপর বানী হাশেমের

সাথে আত্মীয়তা আছে এমন কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জনসমাবেশে চুক্তি ভঙ্গ করার কথা ঘোষণা করে। চুক্তির কাগজ বের করা হলে দেখা যায় যে সেটা খেয়ে ফেলা হয়েছে। শুধু মাত্র কাগজের এক কোণ যেখানে "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" লেখাছিল সেটাই অক্ষত রয়েছে। সংকটের অবসান হল। আর মুসলমান ও বানী হাশেম মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদের দমন ও মুকাবিলায় সেই রকম রূঢ়তা ও কঠোরতা ক্ষণিকের তরেও পরিহার করেনি।

দুঃখের বছর

কঠিন রোগ ব্যাধি আবু তালেবের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়। মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তগুলো গুনতে লাগলেন। মুমূর্ষাবস্থায় যখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তখন রাসূল তাঁর মাথার পার্শ্বে বসে তাকে কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু আবু জেহেল সহ অসৎ সঙ্গীরা যারা তাঁর পার্শ্বে ছিল, তাকে বললো, শেষমূহূর্তে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করো না। মুসলমান হওয়া ব্যতিরেকে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূলের দুঃখ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবু তালেবের মৃত্যুর দু'মাস পরে হযরত খাদীজা (রাঃ) ওফাত বরণ করেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত হোন।তাঁদের মৃত্যুর পরে কুরাইশের ঔদ্ধত্য ও উপদ্রব আরো বেড়ে যায়।

তায়েফের পথে

কুরাইশের ধৃষ্টতা এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের নির্যাতন ও নি-পীড়নের নীতি অব্যাহত থাকার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদের সংশোধন ও ইসলাম গ্রহণ থেকে নিরাশ হয়ে তায়েফ গমনের সিদ্ধান্ত নেন। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। তায়েফ গমন সহজ ব্যাপার ছিল না।আকাশ চুম্বি উচুঁ উচুঁ পাহাড়ের কারণে পথ ছিল দুর্গম। কিন্তু আল্লাহর পথে প্রত্যেক দুরূহ বস্তু সহজ হয়ে পড়ে। তায়েফবাসীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে সর্বাপেক্ষা মন্দ আচরণ করে। তারা শিশু ও কিশোরদেরকে লেলিয়ে দেয়।প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাঁর গোড়ালী করে রক্তে রঞ্জিত। তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন।পথি মধ্যে জিবরাঈল (আঃ) পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাসহ এসে বলেন,আল্লাহ পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন।ফেরেশতা আরজ করলো, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি চান আমি তাদের উপর আখসাবাইন (মক্কাকে ঘিরে রাখা পাহাড়) চেপে দিবো। তিনি বললেন,বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র আল্লারই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করবে না।

চন্দ্র দু'টুকরো হওয়া

মুশরিকরা অনেক সময় রাসূলকে অপারগ,অক্ষম সাব্যস্ত করার ফন্দিতে বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবী করতো। আর এ ধরণের দাবী বারংবার উত্থাপন করেছে তারা। এক বার চন্দ্রকে দু'টুকরো

করার দাবী জানায়,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তাদেরকে চন্দ্র দু'টুকরো করে দেখানো হয়। কুরাইশরা এ নিদর্শন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেখতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ঈমান গ্রহণ করেনি। বরং তাঁরা বলে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাদু করেছে তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বললো,আমাদের যাদু করলেও সব মানুষকে তো আর যাদু করতে পারবে না। দূতের অপেক্ষা কর। বিভিন্ন দূত আসলে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তাঁরা বলে, হ্যাঁ আমরাও দেখেছি। কিন্তু কুরাইশরা নিজেদের কুফরে জেদ ধরে রয়ে গেলো। চন্দ্র দু' টুকরো হওয়া এক বৃহত্তর অলৌকিক ঘটনার পটভূমি ও অবতরণিকা ছিলো। আর তা হল মেরাজের ঘটনা।

মেরাজ

তায়েফ থেকে ফিরে আসা, তাদের রূঢ় ও অমানবিক আচরণ এবং আবু তালিব ও খাদীজার মৃত্যুর পর কুরাইশের অত্যাচার বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তরে একাধিক চিন্তা একত্রিত হয়। মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শোকাহত ও দুঃখে কাতর নবীর সান্ত্বনা আসে। নবুওয়াতের ১০ম সালে রজবের ২৭ তারিখের রাতে তিনি যখন নিদ্রারত ছিলেন, জিবরাঈল বুরাক নিয়ে আসেন। (তবে মেরাজের তারিখের ব্যাপারে আরো ভিন্ন উক্তিও উদ্ধৃত হয়েছে) রবোরাক ঘোড়া সদৃশ এক জন্তু যার দু'টি দ্রুতমান পাখা আছে বিদ্যুতের ন্যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে তাতে আরোহণ করানো হয় এবং জিবরাঈল তাকে ফিলিস্তিনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথমে নিয়ে যান। অতঃপর সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত

নিয়ে যান। এ ভ্রমণে তিনি পালনকর্তার বড় বড় নিদর্শন পরিদর্শন করেন। আসমানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়। তিনি একই রাত্রে তুষ্ট মন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন। ভোর বেলায় কাবাশরীফে গিয়ে তিনি লোকদেরকে একথা শুনালে কাফেরদের মিথ্যার অভিযোগ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরো বেড়ে যায়। উপস্থিত কয়েকজন লোক তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ দিতে বলে। মূলতঃ উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে অপারগ ও অক্ষম প্রমাণিত করা। তিনি তন্ন তন্ন করে সব কিছু বলতে লাগলেন। কাফেররা এতে ক্ষান্ত না হয়ে বলে, আমরা আর একটি প্রমাণ চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, আমি পথে মক্কাগামী একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পাই এবং তিনি কাফেলার বিস্তারিত বিবরণসহ উটের সংখ্যা ও আগমনের সময়ও বলে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সত্যই বলেছেন কিন্তু কাফেররা হঠকারিতা, কুফর ও সত্যকে অস্বীকার করার দরুণ উদভ্রান্ত রয়ে গেল। সকাল বেলায় জিবরাঈল এসে রাসূলকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পদ্ধতি ও সময় সূচী শিখিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে নামায শুধু সকাল বেলায় দু'রাকয়াত ও বিকেল বেলায় দু'রাকয়াত ছিলো।

কুরাইশরা সত্য অস্বীকার করতে থাকায় এ দিনগুলোতে তিনি মক্কায় আগমনকারী ব্যক্তিদের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা চালাতে লাগলেন। তিনি তাদের অবস্থান স্থলে মিলিত হয়ে দাওয়াত পেশ করতেন এবং তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। আবু লাহাব তাঁর পিছনে তো লেগেই থাকতো। সে লোকদেরকে তাঁর থেকে ও তাঁর দাওয়াত থেকে সতর্ক থাকতে বলতো। একবার ইয়াসরিব থেকে আগত এক দলকে ইসলামের আহবান জানালে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং

তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইয়াসরীব বাসী ইহুদীদের কাছে শুনতো যে অদূর ভবিষ্যতে এক নবী প্রেরিত হবেন। তাঁর আবির্ভাবের যুগ নিকটে এসে গেছে। তাদেরকে যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন,তাঁরা বুঝতে পারলো যে, তিনি সেই নবী, যার কথা ইহুদীরা বলেছে। তাঁরা সত্বর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে এবং বলে ইহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হয়। তাঁরা ছিল ৬ জন পরবর্তী বছরে ১২ জন আসে। তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মৌলিক শিক্ষা দেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের সাথে তিনি মুসআব বিন উমাইরকে কুরআন ও দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠান। মুসআব মদীনায় বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক বছর পর তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখন তাঁর সাথে ৭২ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদের সাথে মিলিত হোন এবং তাঁরা দ্বীনের সহযোগিতা ও এর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতঃপর তাঁরা মদীনায় ফিরে যান।

মদীনার দিকে হিজরত

মদীনা সত্য ও সত্যের ধারকদের আশ্রয়ে পরিণত হয়। মুসলমানরা সেদিকে হিজরত করতে লাগলেন। তবে কুরাইশরা ছিল মুসলমানদের হিজরত করতে বাধা দেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য বদ্ধপরিকর। ফলে কতিপয় মুহাজির বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার হোন। কুরাইশদের ভয়ে মুসলমানরা গোপনে হিজরত করতেন কিন্তু উমারের (রাঃ) হিজরত ছিল ব্যতিক্রম। তাঁর হিজরত ছিলো সাহসি-

কতা, নির্ভীকতা ও চ্যালেঞ্জের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তরবারী উম্মোচিত করে এবং তীর বের করে কাবায় গিয়ে তাওয়াফ করেন। অতঃপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বিধবা বা সন্তান-সন্ততিকে ইয়াতীম বানানোর ইচ্ছা করে, সে যেন আমার পিছু ধাওয়া করে। আমি আল্লার পথে হিজরত করছি। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। কেউ পিছু ধাওয়া করার সাহস করেনি। আবু বকর সিদ্দীক রাসূলের নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁকে বলেন, তাড়া হুড়া করো না। আশা করি আল্লাহ তোমার জন্য একজন সঙ্গী নির্দ্ধারণ করবেন। অধিকাংশ মুসলমান ইতিপূর্বে হিজরত করেছেন। কুরাইশরা প্রায় উম্মাদ হয়ে গেল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর দাওয়াতের উন্নতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভয় ও আশংকা বোধ করলো। সবাই পরামর্শ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। আবু জেহেল প্রস্তাব পেশ করল যে, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন নির্ভীক যুবককে তরবারী দেয়া হবে। এরা মুহাম্মাদকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এক যোগে আক্রমণ করে হত্যা করবে। ফলে তার রক্ত বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বনীহাশেম এর পর সব কাবিলার সাথে লড়াই করার হিম্মত করবে না। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দেন। তিনি আবু বাকরের সাথে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। রাতে আলীকে (রাঃ) নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন, যাতে লোকেরা মনে করে যে, রাসূল বাড়ীতেই আছেন, এবং আলীকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, কোন ক্ষতি তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ইতিমধ্যে কাফেররা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। বিছানায় আলীকে

দেখে তাঁরা নিশ্চিত হয় যে, রাসূল বাড়ীতে আছেন এবং হত্যা করার জন্য তাঁর বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো। এ দিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বের হয়ে সবার মাথার উপর বালু ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেন। ফলে তাঁরা আঁচও করতে পারলো না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) সহ প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম ক'রে "ছওর" গুহায় লুকিয়ে থাকেন। কুরাইশ যুবকেরা ভোর বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অন্যদিকে আলী (রাঃ)কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিছানায় দেখতে পেয়ে হতাশ, বিস্মিত হয়ে ক্ষেপে যায়। তারা আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও মার ধর করে ও কোন হদিস বের করতে না পেয়ে চতুর্দিকে লোক জন পাঠলো। তাঁকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারার জন্য ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। লোক জন চারি দিকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলো। একদল তো তাঁর অনুসন্ধানে গুহার দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমন কি তারা যদি একটু ঝুঁকে গুহার ভিতর তাকায়, তাহলে, তাঁদের দেখতে পাই। এমন শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে রাসূলের ব্যাপারে আবু বাকারের (রাঃ) চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। অনুসন্ধানকারীরা তাদের সন্ধান আর পেল না।

গুহায় তাঁরা তিন দিন অবস্থান করে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। পথ ছিল সুদীর্ঘ ও দুর্গম। সূর্য ছিল অতীব উওপ্ত। দ্বিতীয় দিন বিকেল-বেলায় এক তাঁবুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, যেখানে উম্মে মা'বাদ নামে এক মহিলা বাস করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর

কাছে খাবার ও পানি চাইলে সে কিছুই দিতে পারেনি। কিন্তু একটি স্ত্রী ছাগল এতই দুর্বল ছিল যে, ঘাস খেতে যেতে পারেনি। এক ফোঁটা দুধ তার স্তনে ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্তনের উপর তাঁর মুবারক হাত বুলিয়ে দিয়ে দুধ দোহন করে এক বড় পাত্র ভরে নেন। উম্মে মা'বাদ এ অলৌকিক ঘটনা দেখে বিস্মিত ও বিহবল হয়ে পড়ে। সবাই পান করেন এবং ক্ষুধা নিবারণ করেন। অতঃপর আর এক পাত্র ভরে উম্মে মা'বাদকে দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন।

মদীনাবাসী এদিকে তাঁর শুভাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। প্রতি দিন তাঁরা মদীনার বাইরে প্রতীক্ষায় থাকতেন। যে দিন তাঁর আগমন হয়, সে দিন সবাই পুলকিত হৃদয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি মদীনার নিকটে কুবায় যাত্রা বিরতি করেন। এবং সেখানে চার দিন অবস্থান করেন। তিনি এ সময়ে কুবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ। ৫ম দিন তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। অনেক আনসারী সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে অতিথি হিসাবে বরণ করার চেষ্টা করেন এবং তার উটের লাগাম ধরেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদের শুকরিয়া আদায় করে বলেন, উট ছেড়ে দাও, সে নির্দেশ প্রাপ্ত। আল্লাহর নির্দেশ যেখানে হল সেখানে গিয়ে উট বসে যায়। তিনি অবতরণ না করতেই উঠে সে অগ্রভাগে কিছু পথ চলে আবার পিছনে এসে প্রথম স্থানে বসে যায়। সেটাই ছিল মসজিদে নববীর স্থান। তিনি আবু আইয়্যুব আনসারীর অতিথি হোন। আলী বিন আবু তালিব নবীর সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি অসাল্লাম হিজরতের পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন। অতঃপর কুবায় রাসূলের সাথে মিলিত হন।

রাসূল (সাঃ)মদীনায়

উট যেখানে বসে গিয়েছিলো জায়গাটি প্রকৃত মালিক থেকে কেনার পর সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মসজিদ নির্মাণ করেন। মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যে পবিত্র ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। প্রত্যেক আনসারীর জন্য একজন মুহাজির ভাই দেয়া হয় যে, তাঁর ধন-সম্পদের অংশীদার হত। মুহাজির ও আনসারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয়। মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক ছিল। তারা মুসলমাদের মাঝে বিশৃংখলা,নৈরাজ্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টির পায়তারা চালাতো। কুরাইশরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও প্রদর্শন করতো। এ ভাবে বিপদ ও আশংকা মুসলমানদেরকে ভিতরে ও বাইরে ঘিরে ছিল।পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাতে ঘুমাবার সময় অস্ত্র রাখতে বাধ্য হোন।

বদরের যুদ্ধ

এমন বিপদজনক ও বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে আল্লাহ ত'য়ালা সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শত্রুদের তৎপরতা জানার লক্ষ্যে সামরিক মিশন চালানো আরম্ভ করেন। শত্রুদের বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু নেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে লাগলেন যাতে, তাঁরা মুসলমানদের শক্তির কথা উপলদ্ধি করে শান্তি ও সন্ধি প্রক্রিয়ায় এসে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতায় ও তা বাস্তবায়নে কোন ধরণের বিঘ্ন না ঘটায়। কতিপয় গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। একবার তিনি কুরাইশের এক বাণিজ্যিক কাফেলার পথ রুদ্ধ করা কল্পে তিন শত তের জন সাথী

নিয়ে বের হোন। সাথে ছিলো ২টি ঘোড়া ৭০টি উট। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশী কাফেলায় উট ছিলো ১০০০ এবং ৪০ জন লোক। আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বের হবার কথা শুনে জরুরী ভিত্তিতে এক লোক পাঠিয়ে মক্কায় খবর দেয় এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য পথ ধরে। ফলে মুসলমানরা তাদেরকে ধরতে পারেন নি। অন্য দিকে কুরাইশরা এ খবর পেয়ে ১০০০ যোদ্ধা নিয়ে বের হয়ে পড়ে কাফেলার সাহায্যের জন্য। আবু সুফিয়ান কাফেলার নিরাপদে চলে আসার খবর জানিয়ে তাদেরকে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আবু জেহেল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং যোদ্ধারা বদর নামক স্থান পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে। কুরাইশের বের হবার কথা জেনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করলে সবাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার রায় দেন। হিজরী ২য় সনে ১৭ই রমযান শুক্রবার ভোরবেলায় উভয়দল মুখোমুখি হয় এবং তুমুল যুদ্ধ চলে। মুসলমানরা বিপুল ভাবে জয়লাভ করেন। তাদের মধ্যে ১৪জন শাহাদতের অমিয় সুধা পানকরেন। ৭০ জন কাফের নিহত এবং ৭০জন গ্রেফতার হয়। যুদ্ধকালীন নবী কন্যা রুকাইয়্যা মৃত্যু বরণ করেন। হজরত উসমান (রাঃ) রাসূলের নির্দেশে তাঁর রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পরিচর্যা ও দেখা-শুনার জন্য মদীনায় থেকে যাওয়ার ফলে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। যুদ্ধের পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর আর এক মেয়ে উম্মে কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেন। তাই তাঁর উপাধি ছিল "যিন্নূ রাইন"। কারণ তিনি রাসূলের দু'কন্যা বিয়ে করেন। যুদ্ধ শেষে মুসল-মানরা আল্লার সাহায্যে উল্লসিত ও আনন্দিত হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন

করেন। সাথে ছিল যুদ্ধ বন্দী ও মালে গনিমত। যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে কিছু লোককে পণের বিনিময়ে, আবার অনেককে এমনিতে মুক্তি দেয়া হয়।তাদের মধ্যে কিছু লোকের মুক্তি পণ ছিলো মুসলমানদের ১০জন ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়ে দেয়া।

ওহুদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের পর মুসলমান ও মক্কার কাফেদের মধ্যে অন্যান্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওহুদ যুদ্ধ হচ্ছে তন্মধ্যে দ্বিতীয়। এতে মুশরিকরা জয়লাভ করে। কারণ কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলের নির্দেশ যথাযথ-ভাবে পালন করেন নি।ফলে সুপরিকল্পিত কলাকৌশলকে ব্যাহত করে।যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল ৩০০০। পক্ষান্তরে মুসলমান ছিলেন ৭০০ জন।

খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ

এ যুদ্ধের পর মদীনার কিছু ইহুদী মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীকে মুসলমা - নদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি দেয় এবং নিজেদের সমর্থন, সাহায্য -সহযোগিতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ফলে কাফেররা ইতিবাচক সাড়া দেয়। অতঃপর ইহুদীরা অন্যান্য গোত্রসমূহকে উস্কানি দিলে তারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। মুশরিকরা প্রত্যেক এলাকা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দেয়। ১০, ০০০ যোদ্ধা সমবেত হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শত্রুপক্ষের তৎপরতার কথা জেনে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সালমান ফারসী মদীনার যে দিকে পাহাড় নেই, সে দিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। সব মুসলমান

উদ্যম ও প্রেরণা সহকারে পরিখা খননে অংশ গ্রহণ করেন এবং কাজ সত্বর সমাপ্ত হয়। মুশরিকরা এক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেও পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ করে কাফেরদের তাঁবু সমূহ উপড়ে ফেলেন। তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই নিজ নিজ শহরে ফিরে যায়।

মক্কা বিজয়

হিজরি ৮ম সনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কা বিজয় অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেন। ১০ই রমযান ১০০০০ সদস্যের বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন। মক্কায় যুদ্ধ ছাড়াই প্রবেশ করেন। কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা মুসালমান- দেরকে বিজয় দান করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কাবা শরীফ তাওয়াফ করে কাবার অভ্যন্তরে দু'রাকায়াত নামায আদায় করেন। অতঃপর ভেতরে রাখা সব মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। কাবাশরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে মসজিদে হারামে কাতার বদ্ধ ভাবে অপেক্ষারত সমবেত কুরাইশদেরকে বলেন, হে কুরাইশরা! তোমাদের সাথে কি আচরণ করবো বলে মনে করো। তাঁরা বলে, ভালো আচরণ, দয়াবান ভাই, দয়াবান ভাই এর পুত্র। তিনি বলেন, যাও তোমরা সবাই মুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামক্ষমার উজ্জ্বল ও বৃহত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তাঁরাই সেই লোক যারা তাঁর সাহাবাদের উপর চালিয়ে ছিল অত্যাচরের স্টীম রোলার, খুন করেছে অনেককে,কষ্ট দিয়েছে স্বয়ং তাঁকে এবং নিজের মাতৃভুমি থেকে বহিস্কার করেছে। মক্কা বিজয়ের পর লোক জন দলে দলে আল্লাহর

দ্বীনের ছায়াতলে সমবেত হয়। হিজরি ১০ম সনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হজ্জ করেন। এটা তাঁর এক মাত্র হজ্জ ছিল। তাঁর সাথে এক লাখ লোক হজ্জ করেন। হজ্জ পালন শেষে তিনি মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু

প্রায় আড়াই মাস পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। দৈনন্দিন রোগ বেড়ে যায়। তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে আবু বাকার (রাঃ) কে ইমামতি করতে বলেন। হিজরি ১১সনে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ৬৩ বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইন্তেকাল করেন। এ খবর শুনে সাহাবায়ে কেরাম প্রায় জ্ঞান ও স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ খবর বিশ্বাস করতে পার ছিলেন না। এহেন সময় আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ) এক ভাষণে লোক জনকে শান্ত করেন। তিনি বলেন, রাসূল এক জন মানুষ ছিলেন। যিনি মৃত্যু বরণ করেন, যেমন অন্যান্য মানুষ মৃত্যু বরণ করে। মানুষ শান্ত হয়ে যায়। রাসূলের গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও দাফন করা সম্পূর্ণ হলো। অতঃপর মুসলমানরা আবু বাকারকে (রাঃ) নিজেদের খলিফা নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে প্রথম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর ও পরে তের বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

তাঁর চরিত্র

তিনি সর্বাপেক্ষা নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। আলী বিন আবু তালিব বলেন, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হতো, এক দল অন্য দলের মুখোমুখি যুদ্ধ করতো, আমরা রাসূলকে আড়াল হিসাবে রাখতাম। তিনি সর্বাপেক্ষা দানবীর ছিলেন। কখনো কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি না করেন নি। তিনি সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল ছিলেন। নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ নেন নি। নিজের স্বার্থের জন্য কখনো রাগান্বিত হোন নি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর হুকুম-বিধান লংঘন করা হলে আল্লাহর নিমিত্তই প্রতিশোধ নিয়েছেন। অধিকারের ব্যাপারে তাঁর নিকটে আত্মীয়-অনাত্মীয়, দুর্বল, সবল সমান ছিলো। তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, তাকওয়া ছাড়া আল্লাহর কাছে কেউ কারো চাইতে শ্রেয় নয়। সব মানুষ সমান ও সমকক্ষ। পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে ছেড়ে দিতো, আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে শাস্তি দিতো। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ চুরি করে আমি তার হাত কর্তন করবো। কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেন নি। রুচি সম্মত হলে আহার করতেন। অন্যথায় বর্জন করতেন। কোন কোন সময় এক মাস দু' মাস পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতে আগুন প্রজ্বলিত হতো না। তিনি ও তাঁর পরিবার শুধু খেজুর ও পানি আহার করেছেন। ক্ষুধার তীব্র জ্বালা প্রশমিত করার জন্য মাঝে মাঝে উদর মুবারকে প্রস্তর বেঁধে রাখতেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন। তিনি জুতা সিলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন ।এবং গৃহ কর্মে তাঁর পরিবারবর্গের সহযোগিতা করতেন। তিনি অতি নম্র ছিলেন। ধনী-গরীব, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত সবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন। ভাল

বাসতেন গরীব মিসকীনকে প্রচুর। জানাযায় হাজির হতেন। পিড়ত লোকদের দেখতে যেতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দারিদ্র্যের জন্য ঘৃণা করতেন না। কোন রাজা বা শাসককে তার রাজত্ব ও যশ-ঐশ্বর্যের কারণে ভয় করতেন না। ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন। সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ছিলেন। সব চাইতে বেশী স্নিগ্ধ হাসতেন। অথচ দুঃখ বিপদ অনবরত আসতে থাকতো। সুগন্ধ ভাল বাসতেন। দুর্গন্ধ ঘৃণা করতেন। আল্লাহ পাক চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সুন্দর কর্মের অনুপম সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেছিলেন যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্য কাউকে দান করা হয়নি।

তিনি ছিলেন নিরক্ষর। জানতেন না লেখা-পড়া। মানুষের মধ্যে কেউ তাঁর শিক্ষক ছিলো না। আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আসেন মহান গ্রন্থ আল কুরআন, যার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا﴾ الإسراء: ٨٨

অর্থাৎ, 'বলুন, যদি মানুষ ও জ্বীন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য জড়ো হয় এবং তাঁরা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তাঁরা কখনো এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না'। (ইসরাঃ ৮৮) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিরক্ষর হওয়াটাই হলো মিথ্যা অপবাদকারীদের সব অহেতুক প্রলাপের অকাট্য, অপ্রতিরোধ্য ও অখন্ডনীয় উত্তর। যাতে একথা বলতে না পারে যে, তিনি স্বহস্তে

লিখেছেন, বা অন্যের কাছে শিখেছেন, বা অন্য সূত্র থেকে পাঠ করে সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর কতিপয় মু'জেজা

তাঁর সব চাইতে বড় মু'জেজা কুরআন, যা আরবি সাহিত্যের বড় বড় পন্ডিত ও সাহিত্যিকদের অপারগ করে দিয়েছে। এবং সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে যে, কুরআনের অনুরূপ ১০টি সূরা অথবা ১টি সূরা বা অন্ততঃপক্ষে ১টি আয়াত রচনা করে আনো। মুশরিকরা নিজেদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছে। মুশরিকরা একবার তাঁকে একটি নিদর্শন দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াকে দেখান। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অনেক বার তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উৎসারিত হয়েছে। তাঁর হাতে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে। অতঃপর যথাক্রমে আবু বাকার,উমার ও উসমানের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছে। খাবার আহার করাকালীন তাঁর কাছে তাসবীহ পাঠ করতো এবং এর ধ্বনি সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পেতেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির রাতসমূহে পাথর ও গাছ পালা সালাম করেছে। এক ইহুদী নারী রাসূলকে বিষপানে হত্যা করার জন্য ছাগলের এক পা খেতে দেয় যা বিষ মাখা ছিলো। সে পা রাসূলের সাথে কথা বলে। একবার এক বেদুইন তাঁকে একটি নিদর্শন দেখাতে বলে। তিনি একটি গাছকে নির্দেশ দিলে রাসূলের কাছে আসে। আবার নির্দেশ দিলে যথাস্থানে চলে যায়। এক দুধবিহীন ছাগলের স্তনে হাত মুবারাক স্পর্শ করায় দুগ্ধ আসে। তিনি তা দোহন করে নিজেও পান করেন এবং আবু বাকারকেও পান করতে দেন। আলী বিন আবু

তালিবের ব্যথিত চোখে তিনি থুথু দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভাল হয়ে যায়। এক সাহাবী পায়ের আঘাতে আহত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাত বুলিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়। আনাস বিন মালিকের জন্য সুদীর্ঘায়ু, স্বচ্ছলতা এবং সন্তান-সন্ততি বেশী হওয়ার জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁর এসব জিনিসে এত বরকত দান করেন যে,তাঁর স্ত্রীসমূহের ঔরসে ১২০জন সন্তান জন্ম নেয়; তাঁর খেজুর গাছ বছরে দু'বার ফল দিতে লাগে ,অথচ এ কথা সুবিদিত যে খেজুর গাছে বছরে এক বারই ফল আসে। আর তিনি ১২০ বছর বয়স পেয়ে ছিলেন। এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মিম্বারে ছিলেন,এহেন অবস্থায় এক লোক এসে অনাবৃষ্টি ও খরা অবসানের জন্য দোয়ার আরজ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দোয়া করলেন। আকাশে কোন মেঘ ছিল না। হঠাৎ পর্বত সম মেঘ ছেয়ে গেল। মুষল ধারা বৃষ্টি হলো পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত। একই ব্যক্তি অতিবৃষ্টির অবসান হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দোয়া করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ সূর্যের তাপে বের হয়ে গেলো। একটি ছাগল ও প্রায় তিন কিলো গ্রাম গম দিয়ে এক হাজার পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে পেট ভরে খাওয়ান। সবাই খাওয়ার পরেও খাবার সামান্যও কম হয়নি। অনুরূপ ভাবে অল্প খেজুর দিয়ে পরিখা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ান, যে খেজুর বাশির বিন সা'দের কন্যা তাঁর পিতা ও মামার জন্য এনে ছিলো এবং আবু হুরাইরার স্বল্প খাদ্য দ্বারা পরিখা যুদ্ধের মুজাহীদগণকে পেট ভরে খাওয়ান। তিনি এক শ'জন কুরাইশী ব্যক্তি, যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করতে ছিলো,এর মুখের দিকে

মাটি ছিটিয়ে দিলে কেউ তাঁকে দেখতে সক্ষম হয়নি। তিনি তাদের নাকের ডগায় চলে গেলেন। সুরাকা বিন মালেক তাঁকে হত্যা করার জন্যে পিছু ধাওয়া করে আর রাসূল দোয়া করলে তাঁর পা ধ্বসে যায়।